প্রথম প্রকাশ : মে, ১৯৬০

প্রকাশক :
অনিল আচার্য
(অনুষ্টুপের পক্ষে)

মুদ্রক :
দি সরস্বতী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
২ গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন
কলিকাতা ৭০০০০৬

প্রচ্ছদ :
প্রবীর সেন

প্রচ্ছদ মুদ্রণ :
কলো প্রিণ্ট
৮০/২ বৈঠকখানা রোড
কোলকাতা ৭০০০০৯

বাঁধাই :
গৌরাঙ্গ বাইণ্ডার্স :
৭৪ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট
কোলকাতা ৭০০০০৯

সূচী

মে দিন : শতবর্ষের আলোকে

মে-দিন : শতবর্ষের আলোকে

ইংরাজি পঞ্জিকার পঞ্চম মাস 'মে' নামটির উৎপত্তি নিয়ে মতপার্থক্য আছে। কেউ-কেউ বলেন নামটি এসেছে ল্যাটিন 'মাইউস্' থেকে। তবে যতদূর মনে হয় রোমানরা নিজেরাই জানতেন না এই শব্দটির উৎপত্তি কোথায়। তাঁরা বিশ্বাস করতেন নামটি এসেছে এক অতিপ্রাচীন রোমান দেবী 'মাইআ'র নাম থেকে, যে দেবীর কাছে, এখন যে-সময়টা মে মাস, সেই সময়ে, খুব সমারোহ ক'রে পুজো দেওয়া হত, কখনও-কখনও জীবজন্তু বলিদানও। অন্য এক দলের মতে 'মে' নামটি এসেছে 'মাইওরেস', 'জ্যেষ্ঠ' থেকে, কারণ এই মাসটি পূর্ববর্তী জ্যেষ্ঠ মাসগুলিকে সম্মানসম্বর্ধনা জানাতো, যেমন পরবর্তী 'জুন' মাস (উৎপত্তি ল্যাটিন 'ইউনিওরেস', 'কনিষ্ঠ') সম্বর্ধনা জানাতো তরুণ ও অল্পবয়স্কদের। এই 'মাইআ' দেবী সম্পর্কেও আমাদের জ্ঞান খুবই সীমাবদ্ধ : সম্ভবত এই 'মাইআ' শব্দটির মূল অর্থ ছিল 'বৃদ্ধি', এই মাসে প্রকৃতি শীতের অবসানে গ্রীষ্মের বা বসন্তের সূচনায় ফুলেফলে, শস্যে-শষ্পে, তরু ও লতায়, নতুন পাতার বৃদ্ধি ও প্রাচুর্যে সমৃদ্ধ হ'য়ে উঠতো ব'লে। তা যদি মেনে নিই, তাহ'লে পরবর্তী মধ্যযুগের এবং কিছু পরিমাণে আধুনিক য়ুরোপের যে মে-দিনপালনের ঐতিহ্য গড়ে ওঠে—যার সূচনা আরও পূর্বে প্রাক্-খ্রীস্ট শস্যোৎসবে, তার একটা তির্যক ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।

এই মে-দিনকে উপলক্ষ করে প্রাচীন য়ুরোপে যে কৃষি-উৎসব কিম্বা বসন্তোৎসব পালিত হ'ত, স্থানভেদে তার অল্পবিস্তর প্রকারভেদ থাকলেও তার মধ্যে একটা সর্বজনীন রূপও দেখতে পাওয়া যেত। মে মাসের প্রথম দিনে তখন সারা য়ুরোপে ধনীদরিদ্রনির্বিশেষে গ্রামের ও শহরের সমস্ত নরনারী পত্রশোভিত গাছের ডাল, কখনও বা আস্ত একটা গাছ, ফুল, ফুলের মালা, নানাবিধ শস্যের গুচ্ছ বা শীষ নিয়ে সকাল থেকেই শোভাযাত্রায় বেরিয়ে পড়তো। উপস্থিত উৎসব-যোগদানকারীদের মধ্যে থেকেই নির্বাচন করা হ'ত একজন মে-রাজা (যেমন আমাদের হোলী উৎসবের 'হোলীরাজা') এবং একজন মে-রাণীকে। তারপর একটা বিরাট মে-বৃক্ষ প্রোথিত ক'রে তাকে ঘিরে

মাসাধিককালব্যাপী গ্রামের লোকের চলতো নাচ-গান, পান-আহার, আমোদ-আহ্লাদ। উপস্থিত নরনারীদের মধ্যে ধনীলোকও নিশ্চয় অনেক থাকতেন, উৎসবে অংশ নিয়ে অনেক সময় তাঁরা আচারে-ব্যবহারে মাত্রাও অবশ্য ছাড়িয়ে যেতেন, কিন্তু তাই ব'লে এটা কেবলমাত্র ধনীদেরই উৎসব ছিল তা মনে করবার কোনও কারণ নেই।

য়ুরোপে এই উৎসবে স্থানীয় বৈচিত্র্য কেমন ছিল তার ছোট্ট একটা উদাহরণ দিই। য়ুরোপে যে-অঞ্চলটাকে আমরা এখন স্কটল্যাণ্ড ও আয়ারল্যাণ্ড ব'লে জানি, সেখানে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষপর্যন্ত মে-দিনের উৎসবের সঙ্গে প্রাচীন কেল্‌টিক বসন্তোৎসবের কিছু কিছু প্রথাও মিশে গিয়েছিল। বস্তুত এই মে-দিনের উৎসবের সে-অঞ্চলের নামই ছিল অন্য—বলা হ'ত Beltane/Beltene/Beltine কিংবা Beal-Tene (প্রাচীন স্কট্-গেলিক 'Bealtain' থেকে)। এই উৎসবের প্রধান এবং সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক অঙ্গই ছিল গাছপালার ডাল ভেঙে নিয়ে এসে একটা বিরাট বহ্ন্যুৎসব বা bonfire-এর আয়োজন করা। এটি একটি অতিপ্রাচীন অখ্রীস্টিয় উপাসনা-পদ্ধতি যার মাধ্যমে সূর্যদেবতার পূজা করা হ'ত। দুই পাশে দুই বিরাট অগ্নিকুণ্ড জ্বালিয়ে তার মধ্যে দিয়ে উৎসবকারীরা লাফ দিয়ে দিয়ে পার হ'য়ে যেতো। পরে পার করানো হত গৃহপালিত গরু-বলদ-ভেড়া ইত্যাদির পাল। পার হবার সময় কারও হাত-পা পুড়ে গেলে সেটিকে মহা অমঙ্গলের ব্যাপার ব'লে মনে করা হ'ত [এই বেলটেন্ উৎসব থেকেই পরে ইংরাজিতে প্রবাদ এসেছে—'between two fires']। শস্য এবং মানুষের জন্য মঙ্গলকামনা, পরে গৃহপালিত মানুষের বন্ধু পশুদের জন্যও তা ছড়িয়ে দেওয়াই ছিল এই উৎসবের আসল উদ্দেশ্য।

টিউডর যুগে ইংলণ্ডে মে-দিনের উৎসব ছিল জনসাধারণের প্রধান উৎসব। আগে যেমন উল্লেখ করেছি, তেমনি সেখানেও মে-বৃক্ষ রোপণ ক'রে তার চারপাশে নাচ-গান ছিল এই উৎসবের প্রধান অঙ্গ। লণ্ডনে তো সেই সময়ে স্থায়ী 'মে-বৃক্ষ' বা 'মে-পোল্' পোঁতা থাকতো প্রতিবছর সেখানে উৎসব করার জন্য। গোঁড়া খ্রীস্টানরা এই উৎসবকে খুব সুনজরে দেখতেন না। ১৫৮৩ সালে জন্ স্টাব্‌স্ তাঁর 'Anatomy of Abuses' গ্রন্থে বলেছেন, এই পাপী এবং অধঃপতিতরা এক পৌত্তলিক উৎসব এবং তাকে উপলক্ষ্য ক'রে নাচগান ক'রে যা করছেন, তা ধর্মহীন ব্যক্তিদেরই উপযুক্ত।

তা সে উৎসব ধর্মহীন বা ধার্মিকদের হোক বা না হোক, জনপ্রিয়তার

মাপকাঠিতে এই উৎসব ছিল সর্বোচ্চে। অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে সুরু করে যেসব আইরিশ, ফরাসী, ইংরেজ, জর্মন, ইতালিয়ানরা য়ুরোপ থেকে মার্কিন দেশে এবং কানাডায় স্থায়ীভাবে বসবাস করার জন্য চলে যান, তাঁরা এই যে-দিন উৎসবটিকেও তাঁদের সঙ্গে নিয়ে যান। মার্কিন দেশে বা কানাডায় সেসময়ে ভৌগোলিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক কারণে স্থানে স্থানে এর প্রকারভেদ ঘটলেও উৎসবের মূল সুরে এবং ক্রিয়াক্রমে কোনও উল্লেখ-যোগ্য পরিবর্তন ঘটেনি।

২.

এই নির্দোষ বসন্তোৎসবের রক্তক্ষয়ী পরিবর্তন ঘটলো অন্য একটি গূঢ় কারণে। গ্রেট ব্রিটেনের ১৭৫০ থেকে ১৮৫০—এই একশো বছরের মধ্যে ঘটে গেল একটি যুগান্তকারী পরিবর্তন যাকে আমরা বলি 'শিল্পবিপ্লব'। সেই সময়ে নানা ছোটোবড়ো বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, বিশেষ ক'রে বাষ্পীয় শক্তির আবিষ্কার, বয়ন এবং লোহা ও ইস্পাতশিল্পে একটা বড়ো রকমের উন্নতি ঘটিয়ে দিল; শুধু এইসব উৎপাদনমূলক শিল্পেই নয় অন্যান্য বহু ছোটোখাটো শিল্পদ্রব্য উৎপাদনেও এলো নতুন ইঙ্গিত। ব্রিটেনের এতদিনের প্রতিষ্ঠিত ও সর্বতো-ভাবে গৃহীত গ্রামীণ কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি এক ধাক্কায় পরিবর্তিত হ'ল শিল্পভিত্তিক অর্থনীতিতে। বিজ্ঞানের সহায়তায় কলকারখানায় উৎপাদনের হার এবং পরিমাণ অবিশ্বাস্যভাবে বেড়ে গেল; নগদ টাকায় বেতন পেয়ে জীবনযাত্রার মান উঁচু করার আশায় গ্রামের কৃষিমজুররা শহরের কলকারখানায় কাজের খোঁজে গ্রাম ছেড়ে দলে দলে চলে আসতে লাগলো। গ্রামীণ অর্থ-নীতি এবং কৃষিভিত্তিক যৌথ পরিবারগুলি ভাঙনের সম্মুখীন হ'ল; রাস্তাঘাট ও নৌচলাচল-ব্যবস্থার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে যোগাযোগ-ব্যবস্থা ও বন্দোবস্তেরও প্রভূত উন্নতি হ'ল; কলকারখানায় লগ্নীর জন্য ধনাগমের সঙ্গে সঙ্গে পুঁজিবাদের ক্রমপ্রসারের রাস্তাও প্রশস্ত হ'ল।

শিল্পবিপ্লবের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসাবে গ'ড়ে উঠলো বহু ছোটোবড়ো কারখানা-শহর এবং উৎপাদন-পদ্ধতিতে পুঁজিবাদের ভূমিকা প্রধান হওয়ায় একটি নতুন শ্রেণী—পুঁজিবাদী সম্প্রদায়—দেশের ব্যবসাবাণিজ্য থেকে সুরু করে সামাজিক ও রাজনৈতিক স্তরে বিশেষ প্রাধান্যলাভ ও প্রভূত শক্তির অধিকারী হয়ে উঠলো। সমাজে তখন সৃষ্টি হল প্রধানত দু'টি শ্রেণী—

পুঁজিবাদী বুর্জোয়া ধনিকশ্রেণী এবং সর্বহারা শোষিত ও বঞ্চিত শ্রমিকশ্রেণী। মাঝে রইলো মধ্যবিত্ত-কেরানী-উকিল-ডাক্তার প্রভৃতি জীবিকার লোক। তাঁরাও সর্বহারা শ্রমিক-মজুরদের পুঁজিবাদী প্রভুদের অনুকরণে ও অনুসরণে তাদের শোষণে ও বঞ্চনায় লেগে গেল।

এই শিল্পবিপ্লবের চোখধাঁধানো 'প্রগতির' বন্যা গ্রেট ব্রিটেন থেকে আস্তে আস্তে সমগ্র য়ুরোপে এবং তারই ধাক্কায় ছড়িয়ে পড়লো মার্কিন দেশে এবং কানাডায়। নতুন ধনগর্বে, শক্তির মদেমত্ত ধনিকশ্রেণীর তখন লক্ষ্য হ'ল কীভাবে তাদের প্রভূত উৎপাদিত পণ্য বিদেশের বাজার দখল করার উপায় হিসাবে ব্যবহার করা যায়, বাড়ানো যায় বৈদেশিক বাণিজ্য এবং তারই ফলপরিণামস্বরূপ নতুন নতুন উপনিবেশ গড়া। এই উদ্দেশ্য যখন ঘনীভূত হ'ল এবং একটা স্পষ্ট সাম্রাজ্যবাদী রূপ ধারণ করল, চাপটা এসে পড়ল শ্রমিক-শ্রেণীর ওপর। উৎপাদন বাড়ানোর নামে শ্রমিকশ্রেণীকে প্রায় দিবারাত্র খাটানো হ'তে লাগলো, তাদের জন্য না রইলো কোনও বিধিবিধান, না রইলো কোনও নিয়মনীতি।

ফলে, শ্রমিকরা যখন একদিন দেখতে পেলো তাদেরই শ্রমে উৎপন্ন পণ্য-বস্তুর দৌলতে মালিকশ্রেণী দিন দিন অর্থে-সামর্থ্যে স্ফীত থেকে স্ফীততর হচ্ছে এবং তাদের ঘরে ক্রমাগত বাড়ছে অভাব-অনটন, রোগ-ব্যাধি, অশিক্ষা-কুসংস্কার এবং অনশন ও মৃত্যু, তখন তার প্রতিকার হিসাবে তারাও সংঘবদ্ধ হবার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করলো, গড়ে তুলল ট্রেড ইউনিয়ন, দাবী করল ন্যায়সঙ্গত কাজের সময়, কাজ অনুযায়ী সঙ্গত বেতন, কাজের নির্দিষ্ট সময়, ইত্যাদি। সেই সময়ে শ্রমিকদের চোদ্দ, পনেরো এমনকি কুড়ি ঘণ্টা পর্যন্ত একটানা কাজ করতে হোত ইস্পাত-লোহার কারখানাতে জ্বলন্ত চুল্লীর সামনে অন্ধকার খনির মধ্যে হাঁটুজলে দাঁড়িয়ে। সেযুগের শ্রমিকশ্রেণীর একটি বিখ্যাত মুখপত্র 'ওয়ার্কিং ম্যান্স্ এ্যাড্ভোকেট' শ্রমিকদের অবস্থা বর্ণনা করে লিখেছিল: মিশর দেশের প্রাচীন ক্রীতদাসদের চেয়েও দুঃসহ অবস্থার মধ্যে বছরের পর বছর দিন কাটায় রুটিকারখানার কারিগররা। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে আঠারো-কুড়ি ঘণ্টা একটানা কাজ করতে হয় তাদের সেই দুঃসহ পরিবেশে। যেমন রুটি-কারখানায়, অবস্থা তেমনই শোচনীয় জুতোর কারখানাগুলিতে।

এইসব বিবরণ, প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্য এবং এক অঞ্চলের শ্রমিকদের অন্য অঞ্চলে যাতায়াতের ফলে শ্রমিকদের দুরবস্থা শ্রমিকশ্রেণীর কাছে আর অজানা

রইলো না। সকলেই তখন স্থির করলেন এই অসহ্য অবস্থার প্রতিকার করার জন্য, তাঁদের যেভাবেই হোক সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে এই শোষণের এবং অত্যাচারের অবসান ঘটাতেই হবে। শ্রমিকদের মধ্যে তখন সুরু হল সঙ্ঘবদ্ধ আন্দোলন এবং সংগ্রাম।

মার্কিনদেশে সময়টা তখন গৃহযুদ্ধের কাল—১৮৬১ সাল। সমর্থ পুরুষেরা লড়ছেন রণক্ষেত্রে, সেই যুদ্ধের চাহিদা মেটানোর জন্য বাড়ির মেয়েরা এমনকি ছোটো ছোটো বাচ্চারাও জীবিকার তাগিদে কলে-কারখানায় কাজ নিয়ে বাড়ির বাইরে বেরোতে বাধ্য হ'ল। এই অনভিজ্ঞ অদক্ষ নতুন শ্রমিকদের ন্যায্য পাওনা দিতে ধনপতি মিলমালিকদের স্বভাবতই অনীহা, এদের শোষণ ও বঞ্চনারও সীমা রইলো না। যত কম বেতন দেওয়া সম্ভব তাই দিয়ে এদের যত বেশি সম্ভব খাটিয়ে নেওয়া হতে লাগল। সংবাদ চাপা থাকলো না, বিভিন্ন সংবাদপত্রে এসব খবর প্রকাশিত হ'তে থাকলো; ফলে ১৮৬২ সালের শেষের দিকে শুরু হল বিভিন্ন কলে-কারখানায় ধর্মঘট ও উৎপাদনে অসহযোগ। মার্কিনদেশে শ্রমিক-ধর্মঘটের ইতিহাসে এই বিচ্ছিন্ন ধর্মঘটগুলিই সেদেশের বঞ্চিত শ্রমিকদের প্রথম সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিরোধ-প্রচেষ্টা বলে স্বীকৃত।

ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন আমেরিকায় নতুন নয়; দেশটা গ'ড়ে ওঠার সময় থেকেই বিচ্ছিন্নভাবে শ্রমিকরা সঙ্ঘবদ্ধ হবার চেষ্টা করছিলেন। স্থানীয় দাবী-দাওয়ার ভিত্তিতে কারিগরি শ্রমিকরা, ছুতোর মিস্ত্রীরা, ছাপাখানার কর্মীরা, জুতোর কারখানার মজুররা এবং অন্যান্য জীবিকার শ্রমিকরা ১৮শ শতাব্দীর শেষ দিক থেকেই ছোটোখাটো ইউনিয়ন গ'ড়ে তোলেন। ১৮২০ সালেই প্রথম আমেরিকার বিভিন্ন শহরে এইসব ছোটো ছোটো স্থানীয় ইউনিয়নগুলিকে একত্র করে একটা ফেডারেশন সৃষ্টির চেষ্টা হয়, যাতে তারা পরস্পরকে ধর্মঘট, উৎপাদিত পণ্য বিক্রি, শ্রমিকদের ন্যায্য দাবিদাওয়ার ভিত্তিতে মালিকপক্ষ এবং নাগরিকদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা, ইত্যাদি ব্যাপারে সাহায্য করতে পারে। এই ফেডারেশনের নেতারা এরই সঙ্গে রাজনৈতিক দাবিদাওয়াও যাতে ঠিকমতো আদায় করা যায়, তার উদ্দেশ্যে লেবার পার্টি গঠন এবং সদ্য-পাওয়া ভোটাধিকার প্রয়োগ করে লেবার পার্টির নেতাদের নির্বাচনে জেতানোর জন্য শ্রমিকদের কাছে আবেদন রাখেন। তাঁরা দাবী জানালেন শ্রমিকদের কাজের সময় হবে দৈনিক দশ ঘন্টার বেশি নয়; বিনামূল্যে শ্রমিকদের এবং তাঁদের সন্তানদের জন্য শিক্ষা; দেনা শোধ দিতে না পারলে জেলে পাঠানোর

আইনের অবলুপ্তি; অপ্রাপ্তবয়স্ক এবং মেয়ে-শ্রমিকদের কাজের সুযোগসুবিধা এবং তাদের নিয়োগ-নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি। প্রথম প্রথম তাঁরা কিছু দাবী আদায় করতে সমর্থ হলেও সংগঠনের দুর্বলতা এবং নেতাদের মধ্যে নানান মতভেদ থাকায় এই ন্যাশনাল ট্রেড ইউনিয়ন আস্তে আস্তে শক্তিহীন হয়ে আসে। যেটুকু শক্তিওবা তারা তখনও বজায় রাখতে পেরেছিল, তাও প্রায় অবলুপ্ত হয়ে যায় ১৮৩৭ সালের দেশব্যাপী অর্থ নৈতিক মন্দার আশঙ্কায়।

১৮৫০ সালের শেষ দিক থেকে ব্যবসা-বাণিজ্যে আবার উন্নতি দেখা যায় এবং ইউনিয়ন আন্দোলনও সেই সুযোগে আবার জোরদার হয়ে উঠে। এই সময়ে মার্কিন দেশে যোগাযোগব্যবস্থার প্রভূত উন্নতি হওয়ায় নানা ধরনের কারখানা এবং তাদের উৎপাদন ও বণ্টনের সুব্যবস্থার ফলে শ্রমিকদেরও অন্দোলন-সচেতনতা বাড়ে, শহরে শহরে নানাবৃত্তির শ্রমিকরা একত্র হ'য়ে তাঁদের সংগঠন গড়ে তোলেন। এর সূচনা হয় ১৮৫০ সালে গঠিত ছাপাখানা কর্মীদের ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে। ১৮৬৬ সালের ২০শে আগস্ট বাল্টিমোরে ৬০টি ইউনিয়ন নিয়ে পুনর্গঠিত হ'ল ন্যাশনাল লেবার ইউনিয়ন এবং এই প্রথম তাঁরা দাবী করলেন দৈনিক দশ ঘণ্টার জায়গায় আট ঘণ্টার শ্রমদিবস; উৎপাদক শ্রমিকদের সমবায় এবং শ্রমিকদের পুরো রাজনৈতিক কার্যকলাপ চালাবার স্বাধীনতা ও অধিকার।

১৮৭০ সালে আবার মন্দা, চললো প্রায় গোটা দশক জুড়ে। তার মধ্যেও শ্রমিকরা দৃঢ়ভাবে আন্দোলন চালিয়ে গেছেন মালিকদের মন্দার অজুহাতে শ্রমিকদের বেতন কমানো ও ছাঁটাইয়ের নীতির বিরুদ্ধে। এই দশকের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অন্দোলন হচ্ছে ১৮৭৭ সালের রেল ধর্মঘট। মালিক-পক্ষ নির্দয় হাতে এসব আন্দোলন থামাবার চেষ্টা করতেন, তারই পাল্টা হিসাবে পেনসিলভেনিয়ার কয়লাখনি অঞ্চলে সন্ত্রাসবাদী ধাঁচের গুপ্ত শ্রমিক সংগঠন গ'ড়ে উঠেছিল যা সাময়িকভাবে মালিকদের সমস্ত হীন কৌশল ধ্বংস ক'রে দিয়েছিল।

তবে এইভাবে শ্রমিক আন্দোলন দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে চললেও শ্রমিকদের একটি সুসংগঠিত কেন্দ্রীয় সংগঠন ১৮৮০-র পূর্বে কোনওভাবেই গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি। এর আগে ১৮৬৯ সালে য়ুরিয়া স্টিভেন্‌স্‌ গড়েছিলেন 'নাইট্‌স অফ্‌ লেবার' (Knights of Labour), অনেকটা গুপ্ত সমিতির ধাঁচে।

সেটিই এই সময়ে প্রকাশে এল, মার্কিন দেশের সমস্ত শ্রমিক (দক্ষই হোক আর অদক্ষই হোক), খেটে-খাওয়া দিনমজুর, কেরানী এবং অন্যান্য সমজাতীয় জীবিকার কর্মচারীদের একমাত্র শক্তিশালী সংগঠন হিসাবে টেরেন্স পাউডার্লির নেতৃত্বে। শ্রমিক-আন্দোলন নতুনভাবে সংগ্রামের প্রেরণা পেল—তাতে ইন্ধন যোগালো মালিকপক্ষই, ১৮৭৫ সালে দশজন জঙ্গী শ্রমিককে ফাঁসি দিয়ে, যার পরিণামে ১৮৭৭ সালের ইস্পাত ধর্মঘট পায় অবিশ্বাস্য সাফল্য। ১৮৮৪ সালের ৭ই অক্টোবর ফেডারেশন অফ্ অর্গানাইজড্ ট্রেড্স এ্যাণ্ড লেবার ইউনিয়ন অফ্ ইউনাইটেড্ স্টেট্স্ এ্যাণ্ড ক্যানাডা (Federation of Organized Trades and Labour Union of United States and Canada) প্রথম ঘোষণা করলো ১৮৮৬ সালের ১লা মে, মে-দিনের উৎসবের দিন থেকে, দৈনিক আট ঘণ্টা কাজের সময় চালু করতে হবে। ১৮৮৬ সালে অবশ্য এই সংগঠনটির নতুন নাম হয় আমেরিকান ফেডারেশান অফ্ লেবার (American Federation of Labour)। এরা দাবী করলেন ১লা মে ১৮৮৬ থেকে সমস্ত শ্রমিকের জন্য চাই আট ঘণ্টা শ্রম, আট ঘণ্টা বিশ্রাম এবং আট ঘণ্টা আনন্দ। গান বাঁধা হল:

We mean to make things over
    We are tired of toil for nought,
But bare enough to live on ; never
    An hour for thought.
We want to feel the sunshine
    Want to smell the flowers.
We are sure that God willed it
    And we mean to have eight hours.
We are summoning our forces from
    Shipyards shop and mill
Eight hours for work, eight hours for rest
    Eight hours for what we will.

আরও একটি গান সেই সময়ে লোকের মুখে মুখে ফিরতো—সেটি রচনা করেছিলেন Knights of Labour-এর সদস্যরা :

Toiling millions now are waking
See them marching on
All the tyrants now are shaking
Ere their powers gone.

Storm the fort, ye knights of labour,
Battle for your cause :
Equal rights for every neighbour
Down with tyrant laws.

এইভাবে যখন শ্রমিকরা দেশের প্রায় সমস্ত কারখানায় গ'ড়ে তুলেছে '৮ ঘণ্টা কাজের সময়-সমিতি' তখন মালিকপক্ষও চুপ ক'রে থাকেনি। তারা গ'ড়ে তুলল 'পিঙ্কার্টন এজেন্সী' নামে একটা গুণ্ডা-সংস্থা যাদের কাজই ছিল ধর্মঘট-ভাঙার উদ্দেশ্যে মারদাঙ্গা করা, শ্রমিকদের মধ্যে গুপ্তচর হিসাবে ঢুকে গিয়ে গোপন খবর বের ক'রে আনা, ধর্মঘটী শ্রমিকদের মধ্যে ঢুকে প'ড়ে শান্তিপূর্ণ ধর্মঘটকে হিংসাত্মক ক'রে তোলা, যাতে তার সুযোগ নিয়ে মালিকপক্ষ পুলিশের সাহায্যে ধর্মঘট ভেঙে দিতে পারে, ধর্মঘটী শ্রমিক ও তাদের নেতাদের দরকার হ'লে খুন করতে পারে, ইত্যাদি। এই 'পিঙ্কার্টন এজেন্সী'র ভাড়াটে গুণ্ডা এবং ঠাঙাড়েদের যে-কোনও মালিক ভাড়া নিতে পারতেন মোটা টাকার বিনিময়ে নিজেদের কারখানার ধর্মঘট-ভাঙার জন্য। এদের দাপট বিশেষ করে বাড়ে ১৮৭৭ সালের দেশব্যাপী ইস্পাত কারখানার অবিশ্বাস্য সাফল্যের পর।

এরই সঙ্গে কলকারখানার মালিকদের সাহায্যে এগিয়ে এলো ধনিকশ্রেণীর পেটোয়া কাগজগুলি। কাগজগুলি লিখতো : এই সব পাশবিক জীবগুলো (অর্থাৎ ধর্মঘটী শ্রমিক ও তাদের নেতারা) জোর-জবরদস্তি ছাড়া আর অন্য কোনও যুক্তি বা ভাষা বোঝে না। তাই সরকারপক্ষ থেকে এই সব জীবদের দমন করার জন্য এমন সব জোরদার ব্যবস্থা ও দমননীতি প্রয়োগ করা প্রয়োজন, যাতে ভবিষ্যতে এই সব নেতা ও কর্মীদের পরিণাম দেখে অন্যসব নেতা ও ধর্মঘটী শ্রমিকরা সাবধান হ'তে পারে।

বিপদ আরও ঘনীভূত হল পরে। দেশের সমস্ত শ্রমিক-সংগঠন যখন সংগঠিত হচ্ছে ১৮৮৬ সালের ১লা মে'র আট ঘণ্টা সময়ের কাজের দাবিতে 'নাইট্‌স্ অফ লেবার' সংগঠনের নেতা পাউডার্লি হঠাৎ ব'লে বসলেন : ১লা মে উৎসবের দিন ; সেদিন ধর্মঘট, সভাসমিতি বা মিছিল না করে শ্রমিকরা বরং নিজেদের অবস্থা বর্ণনা ক'রে দেশের সব কাগজে চিঠি লিখুন। প্রতিকার যদি তাতে না হয় তখন পরে আন্দোলনের কথা ভাবা যাবে।

শ্রমিকরা এক বাক্যে পাউডার্লির প্রস্তাব বর্জন করলেন এবং আরো দৃঢ়-ভাবে সংগঠন গড়ে তুলতে লাগলেন যাতে পাউডার্লির গোপন নির্দেশ '১লা মে যেন কেউ ধর্মঘট করতে না পারে তা দেখার জন্য পেটোয়া নেতাদের প্রতি অনুরোধ' ব্যর্থ হতে পারে। সরকারের এবং ধনী কল-মালিকদের পক্ষ থেকেও হুমকির পর হুমকি আসতে লাগল ১লা মে'র ধর্মঘট বন্ধ করবার জন্য, কাগজমালিকরাও বশম্বদ ভৃত্যের মতো সরকার এবং কলমালিকদের পক্ষ নিয়ে এই আন্দোলন ভাঙার জন্য জনসাধারণের কাছে আবেদন জানালো। কিন্তু কোনও হুমকিই শ্রমিকশ্রেণীর দৃঢ় সংকল্পকে টলিয়ে দিতে পারল না।

১লা মে, ১৮৮৬, শনিবার। সরকারী হিসেবে সেদিন স্বাভাবিক কাজের দিন ; কিন্তু শিকাগো শহরের একটি কারখানাও সেদিন চালু নেই, আকাশের বুক ফুঁড়েওঠা লম্বা লম্বা চিমনির মুখ দিয়ে অন্য দিনের মতো ধোঁয়া বেরোচ্ছে না। কারখানায় কারখানায় চলেছে মিছিলের প্রস্তুতি ; মিশিগান অ্যাভেন্যুর দিকে যাবে মিছিল। সবাই তাই নিয়ে ব্যস্ত।

ব্যস্ত মালিকপক্ষ এবং সরকারও এই মিছিল বন্ধ করবার জন্য। রাস্তার মোড়ে মোড়ে মোতায়েন হয়েছে সশস্ত্র পুলিশ ; অলিতে গলিতে ওৎ পেতে আছে পিঙ্কার্টন এজেন্সীর খুনী গুণ্ডারা শান্তিরক্ষার অজুহাতে। মালিক-সরকারপক্ষ মিটিঙে বসেছেন শিকাগো শহরকে ধর্মঘটীদের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য। খবরের কাগজগুলি বহুদিন আগে থেকেই আতঙ্ক ছড়াচ্ছেন : ১লা মে শিকাগোর রাস্তায় দাঙ্গা বাঁধিয়ে রক্তের বন্যা ছোটাবে ধর্মঘটী বেয়াদব হিংস্র মজুরেরা, হবে প্যারী কম্যুন দাঙ্গার পুনরাবৃত্তি। অতএব জনসাধারণ দূরে থাকুন, কোনওভাবেই শ্রমিকদের মদত দেবেন না, ইত্যাদি ইত্যাদি।

একসময়ে সেই বহুপ্রত্যাশিত মিছিল শিকাগোর মিশিগান এ্যাভেন্যুর দিকে এগিয়ে চললো। শহরের সমস্ত বড় বড় রাস্তা লোকে লোকারণ্য— জাতি-ধর্ম-বর্ণ-ভাষার সমস্ত বেড়া ভেঙ্গে ফেলে হাজার হাজার শ্রমিক চলেছে

এগিয়ে লেক ফ্রন্টের দিকে, যেখানে মিছিল শেষ হবে। সঙ্গে আছেন শ্রমিকদের বিশ্বস্ত নেতৃদ্বয় পার্‌সন্‌স্‌ এবং অগাস্ট স্পাইজ। 'শিকাগো মেইল' পত্রিকা সেদিন খবর দিল 'সারাদেশে তিন লাখ আশি হাজার শ্রমিক মিছিলে সামিল হয়েছে; এক লাখ নব্বই হাজার শ্রমিক করেছে দেশের বিভিন্ন কারখানায় ধর্মঘট; আর এক শিকাগো শহরেই মিছিলে যোগ দিয়েছে কমপক্ষে আশি হাজার শ্রমিক লেক ফ্রন্টের সভায় মিলিত হ'তে।' এই খবর দিয়ে সম্পাদকীয়তে বলা হয়েছে: এই শহরে সমস্ত নিয়মশৃঙ্খলা ভেঙে দিয়ে ত্রাস এবং অশান্তি সৃষ্টির চেষ্টায় অবাধে ঘুরে বেড়াচ্ছে দু'টি বদমাস কাপুরুষ: তাদের একটির নাম পার্‌সন্‌স্‌, অন্যটির নাম স্পাইজ। আজ লক্ষ্য রাখুন এই দু'জনের দিকে। কোনও অশান্তি ঘটলেই ব্যক্তিগতভাবে তাদের দায়ী করুন; কোনও উৎপাত দেখা দিলেই কঠোর ব্যবস্থা নিন, দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করুন।

কিন্তু ঘটলো না কোন অশান্তি, কোনও উৎপাত, 'প্যারীকম্যুনের দাঙ্গা'র মতো দাঙ্গাও বাধলো না কোথাও। লেক ফ্রন্টের সভায় প্রায় এক লক্ষ্য শ্রমজীবীর উপস্থিতিতে পার্‌সন্‌স্‌ ঘোষণা করলেন সংগ্রামী শ্রমিকশ্রেণীর অদম্য শক্তির কথা, আর ধর্মঘটের সাফল্যের জন্য শ্রমিকদের অভিনন্দন জানালেন স্পাইজ্‌, জর্মন এবং ইংরাজি ভাষার মাধ্যমে।

২রা মে রবিবার, ছুটির দিন। সবাই শান্ত। কিন্তু সোমবার ৩রা মে সুরু হল আবার কারখানায় কারখানায় ধর্মঘট। মালিকপক্ষ এবং সরকার এবার মরীয়া হয়ে উঠলো। এই সময়ে পিঙ্কার্টন এজেন্সীর গুণ্ডারা এবং পুলিশ বিনাপ্ররোচনায় মারদাঙ্গা বাধিয়ে দিল ম্যাককর্মিক হারভেস্‌টার্‌ নামে লক-আউট করা একটা কারখানার সামনে ধর্মঘটী শ্রমিকদের সঙ্গে। খুন হ'ল ছ'জন শ্রমিক সেই কারখানার সামনেই। কত শ্রমিক যে পিঙ্কার্টন এজেন্সীর ভাড়াটে গুণ্ডার এবং পুলিশের ডাণ্ডাবাজিতে আহত হ'ল তার হিসাব নেই।

এই নির্মম হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে পরদিন ৪ঠা মে, মঙ্গলবার শিকাগোর 'হে মার্কেটে' ডাকা হ'ল প্রতিবাদসভা। পার্‌সন্‌স্‌ সেদিন দুপুরেই এলেন শিকাগো শহরে। নারী-শ্রমিকদের একটা সভায় পার্‌সন্‌সের বক্তৃতা করার কথা, আর 'হে, মার্কেটে'র সভায় বক্তৃতা করবেন স্পাইজ—এই ঠিক ছিল। কিন্তু 'হে মার্কেটের' সভা বিশাল আকার ধারণ করায় এবং স্পাইজই একমাত্র বক্তা থাকাটা সঙ্গত হবে না এই বিবেচনায় শ্রমিকরা পার্‌সন্‌স্‌কেও নিয়ে

এলো সেই বিশাল সভায়। শান্তিপূর্ণভাবেই সভা চলছে, স্পাইজের বক্তৃতা শেষ হ'লে পার্‌সন্‌স্‌ বক্তৃতা সমাপ্ত করলেন রাত প্রায় দশটায়। শেষ বক্তা ফিল্ডেন যখন মঞ্চে উঠছেন সেই সময় পুলিশের বড় কর্তা এসে বললেন রাজ্যের জনগণের শান্তি ও শৃঙ্খলার খাতিরে এই সভা এখনই শান্তিপূর্ণভাবে ভেঙে দেবার নির্দেশ তিনি দিচ্ছেন। ফিল্ডেন প্রতিবাদ করে বললেন, সভায় কোনও বিশৃঙ্খলা নেই, নেই কোনও অশান্তি—তবুও সভা বন্ধ করতে হবে কেন! এই সময় পুলিশের লোক এবং উস্কানি দেওয়া পিঙ্কার্টন এজেন্সীর গুণ্ডারা মারাত্মক বোমা ফাটাতে সুরু করলো সভার বিভিন্ন অংশে, সঙ্গে পুলিশের লাঠি ও গুলি, কেবল সভায় যোগদানকারীদের ওপরেই নয়, সভার বাইরেও রাস্তায় রাস্তায়। 'হে মার্কেটে' বয়ে গেল রক্তের বন্যা—কত শ্রমিক যে সেদিন মারা গেল, কতো যে আহত হ'ল তার সঠিক হিসাব আজও পাওয়া যায়নি। স্পাইজ ও ফিল্ডেন গ্রেপ্তার হ'লেন সভাস্থলেই, পার্‌সন্‌স্‌কে সভায় পুলিশ ধরতে পারেনি।

পরের দিন মালিকগোষ্ঠীর সঙ্গে সঙ্গে খবরের কাগজের মালিকরাও ধর্মঘটী সংগ্রামী শ্রমিকদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করলো। 'শিকাগো ট্রিবিউন' লিখলো: এটা সাধারণ ন্যায়বিচারের দাবী যে য়ুরোপীয় আততায়ী আগস্ট স্পাইজ, মাইকেল স্কোয়ার ও স্যামুয়েল ফিল্ডেনকে ধরতে হবে। করতে হবে বিচার এবং ফাঁসী দিতে হবে খুনের দায়ে।...এটাও সাধারণ ন্যায়বিচারের দাবি যে, এদেশে জন্ম নিয়ে যে এ দেশকে কলঙ্কিত করেছে, সেই খুনে এ. আর. পার্‌সন্‌স্‌কে গ্রেপ্তার করতে হবে, বিচার করতে হবে এবং খুনের দায়ে তাকে ফাঁসি দিতে হবে। শিকাগোর এটর্ণী জেনারেল জুলিয়াস গ্রীনেন বললেন আগে হানা দাও, তারপর আইন খুঁজো (Make the raids first and lcok up the law afterwards)। ফলে, পুলিশী দাপট এবং খুনে গুণ্ডা বদমাসদের অত্যাচার চরমে উঠেলা; চললো বেপরোয়া গ্রেপ্তার, মারপিট এবং ঘরে আগুন দেওয়া। শ্রমিক নেতাদের মধ্যে গ্রেপ্তার হলেন সাতজন: স্পাইজ,, ফিল্ডেন, মাইকেল স্কোয়ার, জর্জ এঞ্জেল, এডল্‌ফ্‌ ফিশার, লুই কিং এবং অস্কার নীবে।

তারপর সুরু হ'ল বিচারের প্রহসন: যারা জুরি তারাই এর আগে আসামীদের ফাঁসীতে ঝোলাবার জন্য দাবী জানিয়েছে। বিচারের দিন পারসনস্‌ নিজেই আদালতে হাজির হলেন নিরপরাধ কমরেডদের মিথ্যা

মামলায় জড়ানো হচ্ছে দেখে। আসামীদের কোনও বক্তব্য আদালতে পেশ করতে দেওয়া হবে কিনা তা নিয়েও চললো কথা-কাটাকাটি। শেষে অনুমতি দেওয়া হ'লে প্রথমে বললেন অস্কার নীবে, বর্ণনা করলেন কী অবস্থায় শহরের শ্রমিকরা দিন কাটায়, টাকা উপার্জন করে। ভোর চারটেয় কাজে রওনা হয়ে তারা বাড়ি ফিরতো রাত সাতটা-আটটায়। দিনের আলোয় তাদের পরিবার এবং সন্তান-সন্ততিদের তারা কোনও দিন দেখেনি। তিনি তাদেরকেই তাদের ন্যায্য দাবী-দাওয়ার ভিত্তিতে, সংগঠিত করতে চেয়েছিলেন। এটা অপরাধ হ'লে তিনি অপরাধী। পার্‌সনস্‌ তারপরে একটি কবিতার উদ্ধৃতি : Break the slavery's want and dread / Bread is Freedom, Freedom bread দিয়ে সুরু করলেন তাঁর কথা। কীভাবে ঠ্যাঙাড়ে গুণ্ডারা এবং পুলিশ নিরীহ নিরপরাধ শ্রমিকদের খুন করেছে, কীভাবে ধনিক-শ্রেণীর শোষণ এবং বঞ্চনার বলি হ'য়েছে আমেরিকার শ্রমিকরা, পুঁজিপতিদের কাগজগুলি কীভাবে শ্রমিক-নির্যাতনের উস্কানি দিয়েছে এবং কীভাবে ন্যুইয়র্কের একজন একচেটিয়া পুঁজিপতির হাত দিয়ে বোমা এসেছিল 'হে মার্কেটে'র সভা ভাঙবার জন্য—সব তিনি ফাঁস ক'রে দিলেন। পার্‌সন্‌সের পরে স্পাইজ বললেন : অভাবে ও কষ্টের মধ্যে সারাজীবন থেকে যারা খেটে খাচ্ছে এবং তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম ক'রে যারা মুক্তির আলো দেখবার আশা করছে, আপনারা কি ভাবেন আমাদের ফাঁসিতে ঝুলিয়ে সেই আন্দোলন দমন করতে পারবেন ?

আসামীদের বক্তব্য শেষ হ'লে ১৮৮৬ সালের ৯ অক্টোবর বিচারক রায় দিলেন : স্পাইজ, ফিশার, পারস্‌ন্‌স এবং এঞ্জেল্‌স্‌কে দেওয়া হ'ল মৃত্যুদণ্ড ; অস্কার নীবের হ'ল ১৫ বছরের কারাদণ্ড, অন্য দু'জনের ৮ থেকে ১০ বছরের জেল। বিচারের প্রহসন শেষ হ'ল। সুপ্রীম কোর্টে আপিল করলে সুপ্রীম কোর্ট মামলাটা খতিয়ে দেখতেও রাজি হলেন না। পরের বছর ১১ নভেম্বর চারজন বীর শ্রমিক নেতাকে ফাঁসীতে ঝুলিয়ে হত্যা করল মার্কিন দেশের 'গণতান্ত্রিক বিচারব্যবস্থা'।

অনেক সময় মৃত্যুতেই সব কিছু শেষ হ'য়ে যায় না ; মৃত্যু নতুন সম্ভাবনার দরজা খুলে দেয়। পারসন্‌স্‌, এঞ্জেল্‌স্‌ ইত্যাদির আত্মদান ১৮৮৬ সালের মে-দিনের ঘটনাকে নতুন তাৎপর্য দিল। শুধু মার্কিন দেশের নয়, পশ্চিমের সমস্ত সংগ্রামী শ্রমিক ও বিবেকবান মানুষেরা এই বিচারের নামে খুনের

প্রতিবাদে ফেটে পড়লো। আমেরিকান ফেডারেশন অফ্ লেবার ১৮৮৮ সালের ১লা মে থেকে প্রতি বছর মার্কিনদেশে শ্রমিকদের মিছিল ও সমাবেশের দিন হিসাবে এই দিনটি 'মে-দিন' হিসাবে উদ্‌যাপিত হবে। ১৮৮৯ সালের ১৪ই জুলাই প্যারী শহরে সেকেণ্ড্ সোস্যালিস্ট ইন্টারন্যাশনালের প্রথম কংগ্রেসে ঘোষণা করা হ'ল এখন থেকে প্রতিবছর মে মাসের প্রথম দিনটি আন্তর্জাতিক 'শ্রমিক দিবস' হিসাবে উদ্‌যাপিত হবে।

সভিয়েট য়ুনিয়ানসহ পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশেই আজ ১লা মে 'মে-দিন' হিসাবে পালন করা হয়। মার্কিন দেশে, ইংলণ্ডে, ইতালীতে, কানাডায় এবং অষ্ট্রেলিয়ায় 'মে-দিন' নাই—আছে 'লেবার ডে' বা শ্রমিক দিবস। সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম সোমবার মার্কিন দেশে কানাডায় এবং অষ্ট্রেলিয়ায় জাতীয় ছুটির দিন হিসাবে তা পালিত হয়; যোগ দেয় সমাজের সবশ্রেণীর মানুষ আমোদ-ফুর্তি করার জন্য। ইতালীতে 'লেবার ডে' নেই, আছে রোমের প্রতিষ্ঠাদিবস-পালন। ইংলণ্ডে শ্রমিক-দিবস পালিত হয় হাইড্ পার্কে এবং অন্যত্র ১লা মে'র পরের প্রথম রবিবার।

ভারতবর্ষে 'মে-দিন' প্রথম পালিত হয় ১৯২৩ সালের ১লা মে মাদ্রাজ। তারপর থেকে প্রতি বছর মে-দিন পালিত হ'য়ে আসছে। স্বাধীন ভারতে মে-দিন বহু বছর জাতীয় ছুটির দিন হিসাবে গণ্য ছিল না, এখনও নেই। কেবল পশ্চিমবাংলাসহ কয়েকটি রাজ্যে এই দিনটিকে সাধারণের ছুটির দিন হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে বামফ্রণ্ট সরকারের আমলে।

এই বছর ১৯৮৬ সালে মে-দিন এক ঐতিহাসিক কারণেও স্মরণীয়। এই বছর এই দিনটির শতবার্ষিকী উপলক্ষে বিশেষ ক'রে মনে রাখা দরকার ১৯০৪ সালে লেনিন এই দিনে যে-কথা বলেছিলেন: সকল দেশের শ্রমিকরা শ্রেণীসচেতন জীবনের উত্তরণ, মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণ দমন ও পীড়নের বিরুদ্ধে, তাদের সংগ্রামী সংহতিকে, ক্ষুধা-দারিদ্র্য ও অপমানের হাত থেকে কোটি কোটি খেটে-খাওয়া মানুষের মুক্তি-সংগ্রামকে লক্ষ্য ক'রে, এই দিনটি পালন করে। এই বিরাট সংগ্রামের মুখোমুখি দাঁড়ায় দু'টি জগত: পুঁজির জগত আর শ্রমের জগত, শোষণ ও শাসনের দুনিয়া ও শ্রমিকের দুনিয়া—শোষণ ও দাসত্বের জমানা আর ভ্রাতৃত্ব ও মুক্তির জমানা।

একদিকে বিত্তবান রক্তশোষকরা—তাদের মালিকানায় কল-কারখানা, যন্ত্রপাতি, যার জোরে তারা কোটি কোটি একর জমি ও টাকার পাহাড়কে

পরিণত করেছে ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে, তারা মদতদার হিসাবে পেয়েছে সরকার, তার পুলিশ আর সেনাবাহিনীকে তাদের পুঞ্জীভূত সম্পদের প্রহরী বিশ্বস্ত রক্ষক হিসাবে।

অন্যদিকে আছে কোটি কোটি বিত্তহীন—যারা ধনীদের কাছে জীবনধারণের সামান্য চাহিদার জন্য ভিক্ষা চাইতে বাধ্য হয়, অথচ তারাই শ্রম দিয়ে সৃষ্টি করে সমস্ত সম্পদ। "…কিন্তু আজ অবস্থা বদলেছে; এই সব বিত্তহীন শ্রমজীবীরা আজ যুদ্ধ ঘোষণা করেছে ধনী ও শোষকদের বিরুদ্ধে: দাসত্ব, দারিদ্র্য আর জীবনের সব রকম দৈন্য থেকে মুক্তির জন্য লড়ছে সকল দেশের শ্রমজীবীরা। তারা এমন এক সমাজ-ব্যবস্থার জন্য লড়ছে যেখানে সকলের শ্রমে সৃষ্ট সম্পদ মুষ্টিমেয় ধনীদের জন্য নয়, সমস্ত খেটে-খাওয়া মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত হবে। জমি, কল-কারখানা ও উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত সব যন্ত্রপাতিকে তারা সমস্ত খেটে-খাওয়া মানুষের কল্যাণে সমস্ত শ্রমিকের সাধারণ সম্পত্তিতে পরিণত করবে… ।"

আজকের যুগে সংসদীয় গণতন্ত্র যখন তথাকথিত সাম্যবাদী বিপ্লবীদের একমাত্র মুক্তির আঙিনা, শোধনবাদ যেখানে সাম্যবাদের ছদ্মবেশে দিব্যি চ'লে যাচ্ছে; নিষ্ঠাবান, প্রতিশ্রুত, আত্মত্যাগী প্রকৃত বিপ্লবীদের রক্তে হাত ধুয়ে যখন তথাকথিত মার্কসবাদী বিপ্লবীরা ভাবছেন শাস্ত্রসম্মত বিপ্লব রক্ষা পেল—তখন, এই ভয়ঙ্কর দুঃসময়ে মে-দিন এবং তাঁর তাৎপর্য বিশেষভাবে স্মরণীয়। সেই নবযুগের সত্যনিষ্ঠ, আত্মত্যাগী, প্রকৃত মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী বিপ্লবীদের এবং অগণিত শ্রমজীবী মানুষের প্রতি বিপ্লবী অভিনন্দন জানিয়ে আজ ১লা মে এই কবিতা সঙ্কলনটিকে তাদের উদ্দেশ্যেই শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায় উৎসর্গ করা হোল।

অতীন্দ্র মজুমদার

মে-দিন

বিষ্ণু দে

মে-দিনের গান অক্ষয় প্রাণে
দুর্গত দেশে বঞ্চিত ত্রাণে
তোলে চৈতালী সুর

ওরা ভাবে ঢাকে কাল-বৈশাখী
মরণ ভিখারী শ্মশানের পাখি
মশানে পোড়াবে মেঘ

মে-দিনের গানে আসন্নত্রাণে
হে লালকমল হে নীলকমল
নাগপাশ ছেঁড়ো প্রাণ সন্ধানে
স্বর্ণলঙ্কা চুর্

ওরা কি বাঁধবে সমুদ্রশ্বাস
বৈশাখী মেঘ ঝড়ের বাতাস
রুষবে বজ্রবেগ ?

মে-দিনের গান কালবৈশাখী
ঝড়ে ডানা ঝাড়ে শ্মশানের পাখি
মরণই মরণাতুর

হাজার শকুন ওড়ে পথে ঘাটে
মরিয়া ছলায় শত পাথসাটে
ঢাকে নাকি ঝোড়ো মেঘ ?

হে পৃথিবী আজ এরা উন্মাদ
তোমার সত্যে বৃথা সাধে বাদ
যুগান্তে ভঙ্গুর

কুটিল ভেবেছে কেউটে কামড়ে
কোটালে শকুনে পাখায় চাপড়ে
রুধবে বজ্র বেগ !

হে পৃথিবী মাতা ! বিশ্বজননী
দৃঢ় পদে কড়া হাতে দিন গণি
আশ্বাসে ভরপুর

বিশ্বমাতার এ উজ্জীবনে
বৃষ্টিতে বাজে রুদ্রগগনে
লক্ষ ঘোড়ার খুর

বিশ্বমাতার কোটি সন্তান
দেশে দেশে তোলে তুরঙ্গ গান
অমোঘ নিরুদ্বেগ

কোটি জলকণা এই জনতার
কালবৈশাখী রোখে বলো কার
মেশিনগান বা চেক্ ?

হে পৃথিবীমাতা নীল ধারাজলে
বিদ্যুতে বাজে পুড়ে খাক্ জলে
হে লালকমল হে নীলকমল
পোড়া চোখ শত্রুর

দুই হাতে ডাকে স্বাগত স্বাগত
পথে ঘাটে মিলে গাঁয়ে গাঁয়ে শত
উত্থান বন্ধুর

মিলিত হাতের মে-দিনের মেঘ
তাজিক কাজাক রুশ উজবেগ
হে লালকমল হে নীলকমল
হাজার কসাক্ মেঘ।

মে-দিনের গান

বিমলচন্দ্র ঘোষ

আবার এসেছে পয়লা মে !
হিংস্র বোশেখীর রোদ মাখা ।
ঈশানী মেঘের সন্ধানে
কপালে ভ্রূকুটি আজো বাঁকা ।

কোথা ঝড় কোথা বিদ্যুতের—
খোলা তরোয়াল মেঘে মেঘে ?
ভুখা কলিজায় বিপ্লবের
ঘুম নেই আজ উদ্বেগে ।

সাতসমুদ্রে নোনা বাতাস
রোদের আগুনে তামাটে নীল,
কলের বাঁশীও রুদ্ধশ্বাস
পথে পথে আজ লাখো মিছিল ।

শোষকে শাসকে মুখোমুখি
চেয়ে ত্যাখে শুধু অন্ধকার !
পুঁজির পাহাড় জ্বালামুখী
শোনে মিছিলের হুহুঙ্কার ।

শহীদের ডাক পয়লা মে
দিক্ দিগন্তে শোনায় আজ
কত প্রাণ গেছে সংগ্রামে
উঠেছে বিশ্বে কত আওয়াজ !

আজ তা'রা সব একস্বরে
ডাক দেয় সারা দুনিয়াকে,
যারা ছিল বীজ অঙ্কুরে
মহীরুহ তা'রা বৈশাখে।

আজ শুধু গান ঝড়ের গান
বুকের হাতুড়ী ওঠে নামে ;
রাঙামেঘ আনে ক্ষ্যাপা ঈশান
আজ যে এসেছে পয়লা মে !

রোদে-পোড়া বুক থমথমে
লালপতাকায় ঝোড়ো-হাওয়া !
প্রাণ-সমুদ্রসঙ্গমে
মত্তদাবীর গান গাওয়া।

আওয়াজ তুলেছে পয়লা মে
দিতে হবে পুরো ঘামের দাম,
মরু-বিজয়ের সংগ্রামে
চলেছে মিছিল কী উদ্দাম !

দুর্গে প্রাসাদে মালিকানা
ঘুলঘুলি দিয়ে চেয়ে থাকে
সোনার পাত্রে দামী খানা
বিঘ্ন ঘটায় পরিপাকে।

ভুখা-মজদুর, রাঙাহাসি
হো হো হো শব্দে হেসে ওঠে,
সূর্যের বুকে রাশি রাশি
স্ফুলিঙ্গ-খসা ফুল ফোটে।

পথের মিছিলে ওঠে আওয়াজ
কেঁপে ওঠে যত পাকাবাড়ী,
মজুর-নায়িকা পরেছে আজ
রাঙা-আগুনের রাঙা-সাড়ী।

খোঁপায় রক্তজবা গুঁজে
মুখে বলে শুধু ইন্‌কিলাব !
ফাটল ধরায় গম্বুজে
ধৃতরাষ্ট্রের ওঠে বিলাপ !

১ লা মে, ১৯৫৫

বানান এবং যতিচিহ্ন কবির কাব্যগ্রন্থ 'উদাত্ত ভারত', প্রথম সংস্করণ, আগষ্ট ১৯৫৬, 'কাব্যলোক' প্রকাশিত কবিতা অনুসরণে

মে-দিন

দিনেশ দাস

নাই
কোন রোশনাই।
এপ্রিল-সংক্রান্তি শেষ মে-দিন সূচনা।

গুরু
মেঘ গুরু গুরু।
সবুজ আগুন আজো ধরেনি পাতায়,
সরু সরু শাখা চমকায়।

দোলে
হাওয়ার বাদলে
শুকনো লতার হাড়, পাতা একরাশ :
বাদামী রঙের মরা ঘাস।

ক্ষীণ
ছায়া—ছায়া দিন
আকাশ ময়ূর-নীল – ওলটানো হ্রদ,
ছায়া ফেলে গ্রাম জনপদ।

নীচে
মাটির খনিজে
কৃষ্ণচূড়ায় নীল শিকড়ে শিরায়।
জাগে ফুল আলোর সাড়ায়।

লাল
ফুলের সকাল :
টকটকে লাখো জিভে জীবনের গান
পুরানো যুগের অবসান।

জলে
আলো টলমলে
একটি গোলাপী শিখা হীরক-অন্তরে :
আলো জলে আলোর ভিতরে।

সে দিনের কবিতা

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

প্রিয়, ফুল খেলবার দিন নয় অদ্য
ধ্বংসের মুখোমুখি আমরা
চোখে আর স্বপ্নের নেই নীল মদ্য
কাটাফাটা রোদ সেঁকে চামড়া।

চিমনির মুখে শোনো সাইরেন-শঙ্খ,
গান গায় হাতুড়ি ও কাস্তে—
তিল তিল মরণেও জীবন অসংখ্য
জীবনকে চায় ভালবাসতে।

প্রণয়ের যৌতুক দাও প্রতিবন্ধে
মারণের পণ নখদন্তে ;
বন্ধন ঘুচে যাবে জাগবার ছন্দে,
উজ্জ্বল দিন দিক্-অন্তে।

শতাব্দীলাঞ্ছিত আর্তের কান্না
প্রতি নিঃশ্বাসে আনে লজ্জা ;
মৃত্যুর ভয়ে ভীরু বসে থাকা, আর না—
পরো পরো যুদ্ধের সজ্জা।

প্রিয় ফুল খেলবার দিন নয় অদ্য
এসে গেছে ধ্বংসের বার্তা,
দুর্যোগে পথ হয় হোক দুর্বোধ্য
চিনে নেবে যৌবন-আত্মা॥

মে-দিনের স্বপ্ন

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ঘুম থেকে জেগে ওঠার ক্লান্তি
অথবা আনন্দ.........
জীবনের অভিজ্ঞতা কত রকম হয়।

মানুষে মানুষে এত তফাৎ, আবার কখন
সত্যবানের কাঁধে মাথা রেখে সাবিত্রীর
মিছিলে পথ হাঁটা-

রাস্তাঘাট ক্রমে আগুন।

ঘুমের মধ্যে তখনও আমি পাশ ফিরছি,

স্বপ্ন দেখেছি,
মে-দিন। তারপর এক সময় সম্পূর্ণ ঘুমটাই
ভেঙ্গে যায়।

রাস্তাঘাট এখন আগুন, কিন্তু তাতে মানুষের
সামনে হাঁটার কোনও বিরাম নাই॥

মে-দিন : একটি স্বপ্ন

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

আজ মে-দিন
আমি বিছানায় শুয়ে একবার এপাশ একবার ওপাশ কর ছি
এক সময় পেয়ালা ক'রে চা এলো আর প্লেটে ক'রে বিস্কুট
ঐ সঙ্গে খবরের কাগজ, আজকাল মে-দিনের মিছিলে
নাকি ভিড় হয় না
তাই নিয়ে সাংবাদিকদের দুঃখ···

চার লাইনেই মে-দিনের খবর শেষ,
তারপর রাজীব গান্ধী, ফুটবল, বিজেপি, পাঞ্জাব,
কংগ্রেস আর সিংহল
পড়তে পড়তে আবার আমি ঘুমিয়ে পড়লাম
যখন জাগলাম, তখন সকাল দশটা বেজে গেছে

স্ত্রী এসে বললেন : 'এখন তোমাকে কি খেতে দেবো ?
এতক্ষণ ঘুমোলে, পেটে তো কিছু দিতে হবে !
ডিমসেদ্ধ আর টোস্ট আছে ।
তাই খাবে ?'

বললাম 'দাও' । তারপর জিজ্ঞাসা করলাম
'বড় রাস্তা দিয়ে কোনও মিছিল যায় নি ?'

তিনি বললেন : 'বেলা যায় একটা জ্বলন্ত উনুনের সঙ্গে লড়াই ক'রে ।
তবে না তোমাদের পেটের আগুন নিভবে !
কোথা দিয়ে কখন কার মিছিল যাচ্ছে
কি ক'রে তার খবর রাখি বলো ?
চোখ থাকে উনুনে

আর কান থাকে বাজার থেকে কী এলো আর কী এলো না
—সেই দিকে।'

বললাম : 'আমি কিন্তু শুনেছি, আধো ঘুমের মধ্যেই,
ওরা মে-দিনের ধ্বনি দিচ্ছে!'

এই কবিতাটিই কবির জীবৎকালে মে-দিনের ওপর লেখা শেষ কবিতা।
সংশোধনের মাত্র ছদিন পরে তিনি প্রয়াত হ'ন।

মে-দিন

মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

মে-দিন ফুলের দিন
ইউরোপ টিউলিপলাল আবিরে মাতাল দিক্‌বিদিক
মে-দিন যাদুর দিন
হলদে ড্যাফোডিল ক্রুশে একটি ফুঁয়ে আতুভানচিক্
মে-দিন রক্তের দিন
হে-মার্কেটে মজুরের রক্তে মেশে বিশ্ব-রক্তস্রোত
মে-দিন স্বপ্নের দিন
রক্তে ভেসে পাব কবে মোহনা ও অচিন্ত্য জগত।

মে-দিবসের গান

'সামাহারা হুডি সামাহারা'—
টরণ্টো ওহায়োর ইক্ষুর প্রান্তরে
ডেন্‌ভারে মন্ট্রিলে কারা দিল সাড়া
—'সামাহারা হুডি সামাহারা।'
উইনিপেগের হ্রদে নীল ঢেউ টলমল্‌
যবের শীষের ডগা কাঁচা রোদে ঝলমল্‌
কাটা-ফাটা পোড়ামুখে হাড়মোটা বুক ঠুকে
দু'হাত আকাশে তুলে উল্লাসে ডাকে কারা !
অভ্রের খনিখোড়া দুর্বার মজুরের
গোধুমের খেতে-খাটা চিকো ক্রনো চাষীদের
হুঙ্কারে গর্জনে স্বপ্নে ও জাগরণে
কাজে আর অবসরে মন্ত্র সে লেনিনের
আকাশ-কাঁপানো আর বাতাসে-ছড়ানো ডাক
—চাষী মজুরের রাজ করা চাই খাড়া—
বুড়ো হাড়ে কচি মুখে, নির্ভীক বুক ঠুকে
কুইবেকে এল্‌পাসে প্রাণের শিকড় ধ'রে
দুই হাতে ঘনঘন কারা দিল নাড়া—
—'সামাহারা হুডি সামাহারা' !

'হেই ওক দ্রান দ্রান হেই ওক দ্রান—'
তুর্কমানিয়া আর রুক্ষ আন্‌ডিজান
বার্নলে ধুলো ওড়ে সারি সারি ক্যারাভান
রঙচঙে জমকালো কাবা আর জুব্বাসে

মধ্য এশিয়া গায় গান
—'ভ্রান ভ্রান হেই ওক্ ভ্রান্,'।
ঠন্ ঠন্ পোড়া মাঠে শাবলের সঙ্গীত
সমরখন্দে আছে স্বর্ণের ইঙ্গিত
রাশি রাশি বালুকায় বিত্ত—
আসে দেশবিদেশের লোভী বাজপাখিদের
শাণিত চঞ্চু নিয়ে কালো পাখা মরণের
এলোমেলো সমাগম নিত্য।
তাদের সে জোরদার হামলাকে ঠেকাবার
নিয়েছে শপথ যত তামাটে বজ্র্দার
দুনিয়ার চাষী আর মজুরের কাঁধে কাঁধ
মেলাবে, ব্যগ্র তাই চিত্ত।
খোলা মাঠে বালু ওড়ে খেজুরের ঝোপে-ঝাড়ে
মাঠে মাঠে ঘরে ঘরে তারই আহ্বান।
আরল সাগরে ডিঙি বায় আর মাঝি গায়
—'হেই ওক ভ্রান্,'
চমরীর খুরে খুরে মাঠভরা ধুলো ওড়ে
মধ্য এশিয়া গায় গান
—'ভ্রান্ ভ্রান্ হেই ওক্ ভ্রান্' ॥

'ক্রুকু চাকা রুকু চাকা বুকু চাকা বুম্'—
মেক্সিকো জাগে ভাঙে চেতনার ঘুম।
নীলচে বাদামী রঙে ঢাকা মাঠ বোল্সন,
সবুজ কলার চাষে দিকে দিকে শিহরণ,
লম্বা ঘাসের ঝোপে ঘোড়া ছেড়ে ক্যাবালেরো
দুপুরের ঘুমে নিঃঝুম।
আবার ওদিকে দেখো মাপিমির মালভূমি
হাসিমুখ মোটানাক চটুল চতুরবাক
সারি সারি সিনোরিতা, বাজে ঝুমঝুমি।
সামনে পিছনে নাচে সোম্ব্রেরো টুপি

ডোরাকাটা জামাপরা নারিকেল ছায়াধরা
নম্র খোঁপার সাথে কথা চুপিচুপি।
হঠাৎ আগুন লাগে খোড়োঘরে কানিয়াগে
সাদা স্প্যানিয়ার্ড চোখে অগ্নিবিলাস জাগে
—ঘরে ঘরে তৈয়ার ড্রামে গুমগুম।
অত্যাচারের আর শোষণের সাথে তারা
শেষবার ক'রে নেবে চরম সে বোঝাপড়া
দুনিয়ার হতভাগা এক সাথে হবে খাড়া
ড্রামে গুমগুম—
গ্রেট বাসিনের মাটে বোল্‌সন্‌ মণ্ট্রেরী
গান গায় 'বুকু চাকা বুম্‌'॥

গং গং গং বগো গং গং গং
সুমাত্রা বলীদ্বীপে জাভা আর মালয়ের
ঘরে ঘরে বাজে গ্যামেলন্‌
—গং গং গং!
ঝম্‌ঝম্‌ বৃষ্টির মঞ্জীর ভিজে খেতে
হ্যানয় কাম্বোডিয়া ব্যাংকক্‌ লুইচেতে
হাওয়ায় বাঁশের পাতা দোলে অনুখন।
গালফোলা উঁচুখোঁপা হাতে বালা রংঢালা
রেশমী লুঙিতে অনুপমা—
বাঁশি বাজে চ্যাংমায় কালো পিঠ পৈকায়
হাঁটু জলে ধান বোনে রীতি সনাতন।
ফরাসী বোমারু আসে আকাশ আঁধার ক'রে
দু'হাত কপালে তুলে দেখে কিছুখন ধ'রে
ঘর ছেড়ে পথে আসে মুঠো বাঁধা মন।
আশেপাশে যারা আছে হতভাগাদের কাছে
সকালে শপথ নেয় মাথাউঁচু ইউন্নাচে
—এদের হঠাবো আর বাঁচাবো জীবন।

আমরা তো একা নই ব্রহ্ম ভারত ওই
বিপদে করবে তার বাহু প্রসারণ—
ব্যাংককে বলীদ্বীপে ইন্দোচীনের মাঠে
গম্ভীর গং গং গং—
দুনিয়ার চাষীদের আর যত মজুরের
শপথ সে বাজে অনুখন—
—'গং গং গং বগো গং গং গং' ॥

(১৯৪৪)

মে দিবস

মণিভূষণ ভট্টাচার্য

সোনালি চাঁপায় জ্বলে মে দিনের দীর্ঘ পরমায়ু।
আসে রাত রক্তস্রোত একাকার ক'রে,
টিকেট ঘরের সামনে শ্রমিকেরা কৌটো ঝাঁকায়,
বন্ধ কারখানার কাছে কেউ কেউ তেলেভাজা বেচে-
কলের মালিক নয়, ভৃত্য হতে শিখিয়েছে নেতা—
ব্যক্তিগত সম্পত্তিপ্রচেতা।

ছেলেটা গাছের নিচে শুয়ে আছে একা।
মাথার উপরে পাতা ঝরে,
বিনষ্ট শৈশব গেছে, বাবাও শ্মশানে,
দূর থেকে বক্তাদের তৈলাক্ত ভাষণ শোনে, আর
উঠে সে দাঁড়ায় একবার,
আগুনের কাছ থেকে সব কিছু শেখা
ডাল ভেঙে তুলে নেয় হাতে
ধীরে ধীরে ঘিরে ফেলবে বিশাল অরণ্যে ডান্‌সিনান্‌,
কর্কটক্রান্তির সূর্য পোড়াবে স্বদেশ,
তবু তার চোখে জল আসে।

সারাদিন মানুষকে খোঁজা
শেষ হলে বেড়ে যায় রাত,
মে দিবস হাতিয়ারে ধ'রে রাখে সময়ের হাত
কথাবার্তা বলে জনে জনে
রাত্রি আসে গভীর গর্জনে।

স্পাইজ ফিসার এঙ্গেলস

সমীর রায়

আমি ফুলের কাছে গেছি
পাখীর কাছে
ফুল আমাকে ফিরিয়ে দিয়েছে
পাখীও তাই !
আমি নদীর কাছে গেছি
পাহাড়ের কাছে
নদী আমাকে ফিরিয়ে দিয়েছে
পাহাড়ও তাই !

ফুলের কাছে চেয়েছিলাম রঙ
পাখীর কাছে ডানা
নদীর কাছে চেয়েছিলাম হৃদয়
পাহাড়ের কাছে আকাশ।

রঙ নেই
নেই ডানা
হৃদয় নেই
নেই কোন আকাশ ;
আমি এখন কোথায় দাঁড়াবো !

স্পাইজ, ফিসার, এঙ্গেলস*
তোমরা ফুল হ'তে পারো না ?
স্পাইজ, ফিসার, এঙ্গেলস—
তোমরা পাখী, নদী, পাহাড় হ'তে পারো না ?

---

* স্পাইজ, ফিসার, এঙ্গেলস মে-দিনের প্রথম সংগ্রামের তিন শ্রমিক নেতার নাম। এদের ফাঁসী হয়েছিলো।

মে দিনে

সব্যসাচী দেব

মৃত্যুর নিথর ডাঙা চারপাশে
রুক্ষ এই ঋতু জুড়ে
আগুনের গানও নেই শুধু
দম আটকানো ধোঁয়ার কুণ্ডলি

মধ্যদিনে এভিন্যুর প্রশস্ত প্রাঙ্গণে
ঝরে যায় কৃষ্ণচূড়া
অ্যাসফল্টে মিলিত পায়ের শব্দ
রেখে যায় ছাপ।   ক্লান্তির বিষণ্ণ ঘ্রাণ
লেগে থাকে শরীরে শরীরে।
মিছিলের মানুষেরা ফিরে যায়
ঘর কিংবা ঘরের মতোই কোনো
গূঢ় অন্ধকারে ; আর কিছু দূরে
থেকে যায় কিছুটা মলিন, তবু
রক্তিম পতাকাকে ঘিরে
যাওয়া আসা, ফেরা

মৃত্যু অমোঘ হয়ে তর্জনি নাচায় ;
কী গোপন বীজাণুও ঘর বাঁধে
কোষে কোষে।   তবু বিপন্নতা নয়,
নেমে আসে স্রোত, ছেঁড়া শার্ট
বারবার ভিজে যায় রক্তের প্লাবনে।
ছেঁড়া শার্ট, না কি প্রতিশ্রুতি, রক্তমাখা,
হাতে হাতে ঘোরে
ভুলে যাওয়া কবিতার প্রিয় শব্দাবলী ছুঁয়ে
স্বপ্ন কিংবা স্বপ্নেরও বেশি
নতুন মে-দিনে।

সামসুল হক

আজকাল কোনো ঝড় নেই কেননা শব্দকে আজ ভালো লাগছে না
আজ শব্দহীন ধ্বনিতরঙ্গের দিন

আজ বৃষ্টি নেই
কেননা মল্লিকা তার প্রেমিকের সঙ্গে খুব
জরুরি চাক্ষুষ কথা সেরে নেবে আজ
আজ ভাস্কর্যের প্রদর্শনী
শহরের সব রাস্তা পার্ক জুড়ে আজ ভাস্কর্যের প্রদর্শনী
মল্লিকা আমার সঙ্গে দৃষ্টি সেরে নেবে

কবিদের কোনো কথা নির্ভুল হয় না
তাই
আজও ঝড়
আজও বৃষ্টি হলো

যে দিনের এই সময়

সরোজলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

তোমার চোখ তুমি তীক্ষ্ণ করো এই সময়, যে দিনে
আরো ভেতরে নেমে তুমি ভেতরের মাটি ওপরে তুলে আনো
পতাকা তো প্রোথিত রয়েছে আবহমান নিপীড়িত মানুষের মধ্যে
তার মাথা ঝাঁকিয়ে বিরুদ্ধতা করার ভিতরে
পতাকার রং ফিরতে পারে, মানুষের রং ফেরে না

ওখানে হৃদয়ের রং ছেনে ছেনে তুমি যথার্থ পতাকা বানিয়ে যাও
অন্নের জল ছলছল উত্তোলিত ভালবাসার জোয়ারের ভেতরে
নতুন জমানার বীজ তুমি বপন কর

কোনো দিনের সাঙাৎরা যদি আজ অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে চলে যায়
বেদনার্ত হ য়ো না
তোমার জন্য মোড়ে মোড়ে অপেক্ষা ক'রে থাকবে
ঘরে ঘরে জলভাতলঙ্কার সীমানাহীন আনন্দ।

মে-দিনকে মনে রেখে

রাণা বসু

মালিক এবং শ্রমিকের অভিধানে
'মে-দিন'
শুধুমাত্র শব্দের সূর্যোদয় নয়
আকাশের গ্রহ-তারার মতোই ধ্রুব।

আঠারোশ ছিয়াশির
স্মরণীয় পয়লা মে
যে বিমুগ্ধ মন্ত্র
হাজারো কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছিল
আজও সে-ধ্বনি
আকাশ-বাতাসকে মুখরিত করে।

কেবলমাত্র দু-টুকরো রুটির সংগ্রাম নয়
মেহনতি মানুষদের যথার্থ মর্যাদা
শোষণমুক্ত শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠায়
আবহমান চলার পথের হাতিয়ার
রক্তপতাকার হাতছানি
শত শ্রমিকের অভীক চিৎকার
পথজোড়া দীর্ঘ মিছিল
সব মিলিয়ে
লাল পলাশের পরিপূর্ণ স্বপ্নই
'মে-দিন'॥

পতাকা

বার্ণিক রায়

এমন জটিল অন্ধকারে বেঁচে থেকে কার যে কী লাভ ;

ক্লেদের অচিন্ত্য হাসি ভয়ে চমকে দেয় ;
ভেতরে ভেতরে তবু ফুলের ঘাসের গন্ধস্মৃতি,
আকাশে ব্যথার গান ।
মানুষের ভালোবাসা মুক্তি জেগেছিল কখনো কি শুদ্ধ জ্ঞানে ;
স্বার্থহীন উদারতা ? বিকৃত মস্তিষ্ক লম্পটের
হাতে খেলা করে অস্থি ; হৃদপিণ্ড খোলা, দেহহীন ;
ঔদ্ধত্যের হাহাকার খুবলে খায় প্রাণের আস্বাদ,
রঙিন ঘ্রাণের ব্যথা । সকলেই নিজের পাওনা
নিয়ে চুপ করে থাকে : সংগ্রামের বুলি : ধুলো বালি ।
কীভাবে লড়াই করি, একার কোথাও শক্তি নেই ;
এ ভুবনে আজ সকলেই একা নিঃসঙ্গ বিচ্ছিন্ন ;
নতুবা মানুষ স্তব্ধ নিজের গণ্ডির পতাকায় ॥

সত্যজিৎ মণ্ডল

রোজ ভাবি
আজ নিশ্চয়ই তার সাথে দেখা হবে
যে একদিন আমার বাড়ির দেয়ালে
একটা তাজা আগুনে পোস্টার লাগিয়েছিল
যাতে লেখা ছিল
অশনি আকাশে একদিন
জমা হবে নিশ্চয়ই
কালো বারুদের মেঘ।

রোজ ভাবি
আজ নিশ্চয়ই তার সাথে দেখা হবে
যে একদিন রাস্তার মোড়ে
টুলের উপর দাঁড়িয়ে বলেছিল
একতার জোরে
বহুমুখী জটিলতার মাঝে
আমরা ফোটাবই একদিন
চিরসত্যের ফুল।

রোজ ভাবি
আজ নিশ্চয়ই তার সাথে দেখা হবে
যার হাত ধ'রে আমি
হাসতে হাসতে
দুর্গম পাহাড়ের পথ পার হবো।

রোজ ভাবি···আমি রোজ ভাবি···
রোজ ভাবি, আজ নিশ্চয়ই তার সাথে দেখা হবে

যা কিছু মানুষের

অমল চক্রবর্তী

মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে-আসা হাত
সেই হাত ঘিরে গড়ে-ওঠা অনন্ত মাটি

রক্তে ভারি হয়ে শেষ জোছনার মতো এক আকাশ কামিজ
আর গা থেকে আগুনের মতো ডাইনে বাঁয়ে কাটতে-থাকা স্বপ্ন

যাকে নদীর জলে হাত দিলেই টের পাওয়া যেত সেই
দুনিয়া-জোড়া ফ্রেম আজ ঢুকে পড়েছে তোমাদের ড্রয়িংরুমে

তোমাদের নুলো হাতে বড় নোংরা নখ, মনে পড়ে
কলহ আর লোভের আস্তরণ সরিয়ে মনে পড়ে, একদিন ছিল ?

তোমাদের কান গেছে, অথচ আজো এক একটা শব্দ
আমাদের বুক ছিঁড়ে দেখিয়ে দেয় সেইসব যা মানুষের

মে দিন

অমিত চক্রবর্তী

ছুটির আমেজ আর হৈ হুল্লোড়ে
যেন ঢেকে যায় না মে দিন .
তাঁদের স্মৃতিকে ধরে রেখো
পৃথিবী নতুন হয় যার ব্যবহারে ।

তোমাকে যে-মেয়েটি ভালবাসে তার সকালবেলা
সবুজ ঘাসে কাঁচের পুঁতির মতো শিশিরকণা
তোমার রোদ্দুরকেই চায়, বাষ্প হতে,
তুমি তাকে মেঘ ও বৃষ্টি হতে সাহায্য কর ।

স্মৃতি শুধু স্মৃতি নয়, আছে প্রতিদিনের আকাশে
যা দেখে অতিক্রম করা যায় নদী দুঃখের
অথবা প্রশিক্ষণ নেওয়া যায় চরিত্রের,
পাহাড় ও ঝর্ণার ধারে মানুষের পাথর হেঁটে যায় ।

রুটি আর কাজ

সাগর চক্রবর্তী

যাত্রাদলের ভীমের মতন ঘুরিয়ে গদা
বাছাবাছা আগুনখাওয়া গরম কথার
হরিরলুটের ফুলবাতাসা ছড়িয়ে দিয়ে
রাঙতামোড়া মর্চেধরা সিংহাসনের চতুর্দিকে
ঘুরে ঘুরে চোর পুলিশের
ছেলেখেলার দিন গ্যাছে হে।

এবার তবে সটান বুকে
দাঁড়াই, বলি : তিনটে দশক
পার হলো স্রেফ ছায়ার সাথে কুস্তি লড়ে।
এখন খিদে জানান দিচ্ছে নানানভাবে মোচড় মেরে
এভাবে আর চলবে না হে—
নতুনতরো রাস্তা খোঁজো।
কাজ আর রুটি— এই কথাটাই
আসল কথা।
কাজ আর রুটি—। হে সংবিধান বিধান করো।

এসো, টেনে নামাই উঁচু মঞ্চ থেকে বচনবাগীশ কর্তাভজা
সেবাদাসদের
এসো, বলি—ঢের হয়েছে, থামুন মোশাই !
আসল কথা—কাজ আর রুটি
রুটি এখন বুকের খুনের চেয়েও দামী।
তাই যদি না দিতে পারো
তিন লাথিতে
ভাগিয়ে দিয়ে, উড়িয়ে দেবো রক্তনিশান—
শ্রমিক কৃষক সর্বহারার !

রণপায়ে দিন
সমস্ত দেশ   আওয়াজ দেবে
একটি শ্লোগান :
কাজ আর রুটি !!

কাজ আর রুটি !
হে সংবিধান,   পারো যদি   বিধান করো !!

ঝড়ের পতাকা, মে-দিন
বিপুল চক্রবর্তী

চাই না মিছিল হাজারো অশ্বখুরে
পতাকার ঝড় চাই না শহর জুড়ে
ঝড়ের পতাকা, মে-দিন, তোমার
ঝড়ের পতাকা চাই ।

স্বদেশ আমার বুটে ও চাবুকে ঘেরা
দিনে দিনে আরো সতর্ক ঘাতকেরা
তবু তোলপাড় মাটি ও পাহাড়
চড়াই ও উৎরাই ।

চাই না সাজানো মঞ্চ এমন দিনে
ফুলের মোড়ক বামে আর দক্ষিণে
চাই না সভার সমারোহ আর
আলোকের রোশনাই ।

স্বদেশ আমার সাথীদের খুনে লাল
খুন যত ঝরে ঢেউ তত উত্তাল
বারে বারে মার খেয়েও আবার
ফিরে আসি আমরাই ।

চাই না মিছিল হাজারো অশ্বখুরে
পতাকার ঝড় চাই না শহর জুড়ে
ঝড়ের পতাকা, মে-দিন, তোমার
ঝড়ের পতাকা চাই ।।

['তোমার মারের পালা শেষ হ'লে' কাব্যগ্রন্থ থেকে]

মে-দিবসের শপথ

শক্তিপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

তুমি আসো বছর পেরিয়ে যুগযুগ, শতাব্দীর ওপার থেকে,
শ্রমজীবী বঞ্চিত মানুষের চেতনায়, মুক্তির প্রত্যয় নিয়ে।
মে-দিনের শ্রমিক যুবতী যে উৎসবের দিন,
মে-রানীর সাজ ছুঁড়ে ফেলে মিছিলে সামিল হয়েছিল।
আওয়াজ তুলেছিল হাজার হাজার শ্রমিকের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে-
এই অমানুষিক শ্রমদানে আমরা ক্লান্ত, অবসন্ন।
ক্ষুধার অন্নটুকুও আমাদের ঘরে নাই।
সুন্দর এ পৃথিবী চোখ মেলে দেখার কিম্বা
মহৎ কোনও ভাবনার আমাদের অবসর কোথায়?
এই অবস্থার আমরা পরিবর্তন চাই।

বুলেটবিদ্ধ বুকগুলো বুকে বুক বেঁধে এগিয়ে চললো—
ওদের রক্তে ভেজা লাল নিশান ওরা তুলে ধরেছিল
বিশ্বের মেহনতী মানুষের দৃষ্টির সামনে,
তাদের চেতনায়, স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার প্রতিজ্ঞায়।
তারপর রুশ চীন কিউবা ভিয়েৎনামে দুনিয়াকাঁপানো জয়ের
পা ফেলে ফেলে তুমি যখন এখানে এলে,
তোমার লাল রক্ত তখন শুকিয়ে কালো হয়ে গেছে॥

তুমি শুধু এখন এক উৎসবের দিন।
লে-অফ ক্লোজার, লক-আউটে ছাঁটাই শ্রমিকের বউ
ছেঁড়া শাড়ি তালি মেরে উৎসবের মে-রানী সাজে।
শ্রমিক-মালিকের ভোজের আসরে উপোসী শ্রমিক
মালিকের দীর্ঘজীবন কামনায় স্বাস্থ্যপান করে;
উৎসবের ঝলমলে আলোয় তার শীর্ণ কালো মুখে
সে দিনের অতো লাল রক্তের আজ চিহ্নমাত্র নেই।

তাই তোমার শুকিয়ে-যাওয়া কালো রক্তের মরা নদীতে
তাজা লাল রক্তের বন্যায় আজকের শপথ হোক
সেই দিনকে আমরা সংগ্রামের পথে টেনে আনবো ঃ
যেদিন লক্ষ লক্ষ শ্রমজীবী মানুষ এগিয়ে যাবে
দেশজোড়া অসংখ্য রক্তাক্ত হে-মার্কেটের পথ বেয়ে,
শোষণ-বঞ্চনামুক্ত তাদের অধিকারের
নতুন এক দেশে ।

মে-দিবস

অনিল বসু

মে দিবস বার বার বয়ে আনে বসন্তের দৃপ্ত সম্ভাবনা,
প্রান্তরে পলাশ ফোটে, কৃষ্ণচূড়া মন্দার শিমুল
তাপদগ্ধ ঘূর্ণীঝড়ে মেলে দেয় লাল উত্তরীয়,
পৃথিবীর বুক থেকে লাল ধুলো পাক খেয়ে ওঠে
কী প্রমত্ত হোলি। তবু ভারতবর্ষ যেন এক
প্রৌঢ়-সংযমে দূর বেলাভূমি থেকে ঢেউ দেখে॥

সমস্ত সমুদ্র জুড়ে দুর্নিবার ঝড় বয়ে যায়
সংক্ষুব্ধ লাভার স্রোতে মাটি থরো থরো
বুকে বুকে জ্বলে যায় চৈত্র-নীল-চিতা
গাজনের শিব তবু জটা খুলে ত্রিশূল তোলে না;
সমস্ত ভারতবর্ষ আশির দশকে
কী আশ্চর্য যেন এক সামঞ্জস্যহীনতায় স্থির।

সৌর-প্রদক্ষিণের মত গতানুগতিক
মে দিবস ঘুরে ঘুরে শতবর্ষ পূর্ণ করে,
ঘুরে ঘুরে সেই লাল-রক্তাক্ত সড়ক
সামনে মেলে ডাক দেয়,—'নেমে এসো,
পথ থেকে পরে নাও রক্তের তিলক
এ-রক্তের প্রতি বিন্দু জয়ে উদ্ভাসিত, পবিত্র মহান।

মাদল বাজাও, বীর পিঠে বাঁধো দৃঢ় ধনুঃশর
আবার বসন্ত এলো, বিকশিত কৃষ্ণচূড়া মন্দার শিমুল;
মে দিবস বসন্তের ফুল। পথে পথে রক্তের হোলিতে
আমাদের সুরু হোক বসন্ত-উৎসব।'

লোকটা : সে-দিনে

জীবন গঙ্গোপাধ্যায়

ভালো ভালো কথাগুলির নিচে
চাপা প'ড়ে
যে-স্বপ্নগুলি আজ রক্তহীনতায়
শাদা
তাদের একদিন অসম্ভব লাবণ্য ছিল।

দোষটা কার ?
কথাগুলির, না স্বপ্নের ?
—এইসব ভাবতে ভাবতে
একজন বন্ধ কারখানার শ্রমিক
তার ভাড়া বাকি-পড়া বাসার জানালা খুলে
দেখতে পেল সূর্যোদয়—
হলুদ, বিষণ্ণ আর ম্রিয়মাণ।

কিন্তু তার চোখ, চোখের মণি
দেখতে কি চেয়েছিল এইসব—এইসবই ?

রক্ত তোলপাড় করা ভিতরকার প্রশ্নের
কঠিন পাথরগুলি
পরস্পর ঘর্ষণে
বড় আগুন জ্বালায়
তার নিদ্রাহীন ঘুমে, আর রাত্রিহীন
রাতের গভীরে।

১৮৯১

লবণ হ্রদ

সুব্রত রুদ্র

একদিন সকালে চুল আঁচড়ানো শেষ ক'রে মুখে
মানুষের চর্বি দিয়ে তৈরি ক্রিম
মাখতে লাগল মানুষ।
তারপর একটা শিশি থেকে খানিকটা
মানুষের হাড় নিংড়নো গ্লিসারিন
মাখলো ঠোঁটে।

ঘানিতে ফেলে বের করা হলো
মানুষের জন্য মানুষের তেল।

মোটা মোটা লোহার পাইপে ক'রে
শিশুশ্রমিকদের মাংস এনে ভরিয়ে ফেললাম জলা-
নাম রাখা হলো নতুন লবণ হ্রদ।

জগৎসংসার কাঁপিয়ে জন্মাচ্ছে মানুষ,
খিলখিল ক'রে হেসে উঠছে
একদল মানুষের জয়।

মে ডে'তে কিছুতেই আর কবিতা লিখতে পারি না

সৃজন সেন

ডালহৌসি জুট মিলের জঙ্গী শ্রমিক
কমরেড বিশ্বনাথ
আমার কানে কানে ফিস্‌ফিস্‌ করে বলেছিল—
'মে-ডে'কো লেকর আচ্ছা একঠো পোয়েট্রি লিখ দিয়ে কমরেট,
হামলোগ পোষ্টার বনা কর কাল
কারখানা গেট মে সাঁট দেগা !'

একাত্তরের ভারতবর্ষের রক্ত-উন্মাদনা নিয়ে
মজদুর মহল্লার একটি ছোট্ট ঘরে লুকিয়ে ছিলাম,
সত্তর দশকের মধ্যে ভারতবর্ষকে মুক্ত দেখার স্বপ্নকে বুকে
আঁকড়ে ধরে
আমার সামনে ছট্‌ফট্‌ করছিল কমরেড বিশ্বনাথ,
আমি দু'লাইনের একটি কবিতা তার হাতে লিখে
দিয়েছিলাম,
কমরেড বিশ্বনাথ মহা উৎসাহে ভাঙা ভাঙা বাংলায়
চিৎকার করে করে সেই লাইন দু'টি পড়েছিল—
'এবার বোসন্তে গোর্জায় মেঘ,
আসমান লালে লাল,
মে-ডে এবার যুদ্ধ জোয়ের
বোদলা নেবার কাল।'
এবং 'বহুত আচ্ছা হুয়া' বলে বিশ্বনাথ
একবার হেসে কবিতাটি নিয়ে
উল্কার মত
রাতের অন্ধকারে হারিয়ে গিয়েছিল।

তার পরদিন
পয়লা মে।

ভোর হোতে না হোতেই শ্রমিক মহল্লায় ছড়িয়ে পড়েছিল
একটা চাপা আনন্দ,
সমস্ত সিকিউরিটির চোখকে ফাঁকি দিয়ে
ম্যানেজারের হলুদ কোয়ার্টারের ছাদের ওপরে
কে বা কারা উড়িয়ে দিয়েছিল
একটি লাল পতাকা,
কারখানা গেটে জ্বলজ্বল করে জ্বলছিল একটি লাল পোষ্টার,
আর, সন্ধ্যাবেলা
কারখানা গেটের সামনে
প্রকাশ্য রাস্তায়
বলি দে'য়া মোষের মত
রক্ত মেখে ছট্‌ফট্‌ করতে করতে
স্থির হয়ে গিয়েছিল
কোম্পানীর কুখ্যাত দালাল,
বহু শ্রমিকের গুপ্ত ঘাতক—
সর্দার গোপাল সিং।

সে রাতে মিল মহল্লা হয়ে উঠেছিল
গেষ্টাপো অধিকৃত
যেন কোনো জার্মান শ্রমিক অঞ্চল।
পুলিশ ও গুণ্ডাবাহিনীর আক্রমণে
জ্বলেপুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছিল
কমরেড বিশ্বনাথের ঘর ও তৎসংলগ্ন বস্তি,
চলেছিল অবাধ লুটতরাজ,
খুন হয়েছিল সাত সাতজন শ্রমিক,
আর নির্বিচারে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল
শ'খানেক নারী-পুরুষ আর শিশুকে।

তিনদিন পরে এক রাত্রিতে
সাত মাইল দূরের এক গ্রামের ঘরে

সারা অঙ্গে অন্ধকার জড়িয়ে
বিশ্বনাথ আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল।
তার চোখেমুখে নিঃশব্দে হা হা করছিল যুদ্ধজয়ের হাসি,
বিশ্বনাথ আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল—
'কৈ নয়া পোয়েট্রি লিখা হায় কমরেট ?'
আমি ওর মুখের দিকে তাকাতেই
ওর চোখে দপ্ করে জ্বলে উঠেছিল ক্রোধের আগুন,
দাঁতে দাঁত চেপে ও আমাকে বলেছিল—
'বহুত কমরেটকো মার দিয়া কুত্তালোগ !
হামলোগোকো বদলা লেনা হি পড়েগা।'

দুরন্ত নদীতে বাঁধ দিয়ে
আসন্ন প্লাবন রুখবার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে
আমি বিশ্বনাথকে বলেছিলাম—
'খুনকা বদলা খুন নেহি ভাই,
জমানা কো বদল ডালো !'
আমার মুখে ঐ কবিতা শুনে
বিশ্বনাথ কেমন যেন অবাক হয়ে গিয়েছিল,
আমার দিকে নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে
আমার মুখের মানচিত্রকে ভালো করে পড়বার
চেষ্টা করেছিল,
তারপর ম্লান অথচ দৃপ্তকণ্ঠে সে আমাকে বলেছিল—
'শান্তি-বুলি মৎ বোলো ভাই,
দুষমনকো মৎ ডরো !'
এবং তারপরই হো হো করে হেসে
আমার পিঠে সজোরে এক চাপড় মেরে বলেছিল—
'চলতা হ্যায় কমরেট,
ফির মিলেঙ্গে !'

সেই বিশ্বনাথ ফিরে আর আমার সঙ্গে দেখা করতে
কোনদিন আসেনি।

চার পাঁচ দিন পরে
শ্রমিক মহল্লারই কোন এক বাড়ীতে
সশস্ত্র গুণ্ডাবাহিনীর আক্রমণে
অভিমন্যু হয়ে গিয়েছিল কমরেড বিশ্বনাথ
আর ধরা পড়ে আমি গিয়েছিলাম জেলে।

জেলখানায় তারপর
তিন তিনটি মে-ডে'কে আমি অতিক্রম করেছি,
জেলের কৃষ্ণচূড়া গাছটার বুকে
ফুল ফোটা ও ফুল ঝরা দেখেছি তিন তিন বার,
একবার কালবৈশাখীতে
ফুলশুদ্ধু ভেঙে পড়তে দেখেছি
সে গাছের বিরাট এক ডালকে।
তারপর একদিন জেলের বাইরে বেরিয়ে এসে দেখলাম
পরিত্যক্ত রণভূমিতে
আহত নিহত যোদ্ধাদের হাড়মাংস চিবিয়ে খাচ্ছে
অসংখ্য ঘেয়ো কুকুর,
—আনন্দে যারা দিশেহারা !

ঠিক সেই সময়,
এক ফুটন্ত বৈশাখী দুপুরে,
কমরেড বিশ্বনাথের বৌ পার্বতিয়া আমার সঙ্গে
দেখা করতে এসেছিল,
দু'চোখে এক নদী স্নেহ মায়া ভালোবাসা নিয়ে
সে আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল
আমার আর অন্যান্য কমরেডদের সমাচার।
তারপর ধীরে ধীরে সেই নদীতে ঝড় উঠলো,
ফুলে উঠলো সে নদীর জল,
পার্বতিয়ার দু'চোখে জ্বলে উঠলো প্রতিহিংসার আগুন,

আমার চোখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে
পার্বতিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলো—
'কমরেট, কাল মে-ডে হ্যায় না ?
লিখা হ্যায় কৈ নয়া কবিতা ?'
পার্বতিয়ার সেই জ্বলন্ত দৃষ্টির সামনে
আমি কেমন নিস্পন্দ হয়ে গিয়েছিলাম,
আমার গলা দিয়ে কোন স্বর উচ্চারিত হচ্ছিল না,
পার্বতিয়া আমার দু'কাঁধে হাত দিয়ে
প্রবল ঝাঁকুনি দিতে দিতে বলেছিলো—
'কাল তো মে-ডে হ্যায় কমরেট !
খুনকা বদলা খুন নেহি লেগা কাল ?
কমরেট কো খুনকা বদলা ?'

এবং তার পরদিন মে-ডে'র বিকেলে
গরমতলাও ব'স্তর রাস্তায়
এক তরুণের হাতে গর্জে উঠেছিল একটি পাইপ গান,
লাফ দিয়ে ছুটে পালিয়ে বেঁচেছিল
কমরেড বিশ্বনাথের হত্যাকারী যমুনা সিং,
আর 'ডাকু' 'ডাকু' চিৎকার আর হৈ-হট্টগোলের মধ্যে
ইনকিলাব ধ্বনি দিতে দিতে
চিরকালের জন্য স্থির হয়ে গিয়েছিল
অভিমন্যুর ছেলে পরীক্ষিৎ,
কমরেড বিশ্বনাথের ছেলে বীরেন্দ্রনাথ,
—শহীদ বাপ্‌কা লেড়কা বনে গিয়েছিল
দোসরা শহীদ !

অতীনদা, আপনার আর বীরেনদার সম্পাদিত
মে-দিনের কবিতা সংকলনের জন্য
আমার কাছে দেবার মত কোন কবিতা নেই,

মে-ডে'কে নিয়ে সেই দিন থেকে আমি আর কোন কবিতা
লিখতে পারি না,
কেননা
প্রতিটি মে দিবসে
কালবৈশাখীর আলুথালু মেঘের মত চুল নিয়ে
আমার সামনে এসে দাঁড়ায়
শহীদ জায়া ও শহীদ জননী পার্বতিয়া,
আমার দুকাঁধে হাত রেখে
প্রবলভাবে ঝাঁকুনি দিতে দিতে সে আমাকে জিজ্ঞাসা করে-
'আজ তো মে-ডে হ্যায় না কমরেট ?
লিখা হ্যায় কৈ নয়া কবিতা ?
বদলা লেনেকা কবিতা ?'

অতীনদা, আমি সেই কবিতা কিছুতেই লিখতে পারি না,
কোন্ কবিতা লিখবো আমি —
বদলা নেবার কবিতা
না
জমানা বদলের কবিতা ?